যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৩ মার্চ ২০২৫, ১১:০৬ এএম

উপসম্পাদকীয়

অন্যমত

শিক্ষা বাঁচাতে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

আবু আহমেদ
প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ভাবতে কষ্ট হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষক ইংরেজি জানেন না। তাদের ইংরেজি কোনো প্রকাশনাও নেই। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথাও নেই। তাদের মাথাব্যথা হলো প্রশাসনিক পদে বসার জন্য।

প্রশাসনিক বড় বড় পদে বসার জন্য তাদের তদবিরের অভাব নেই। বলতে দুঃখ লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপাচার্য হওয়ার জন্য সচিবালয়ে গিয়ে ঘুরঘুর করেন। পদ-পদবির জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। কারণ পদ-পদবি পেলে তারা তাদের নামের আগে-পিছে কিছু লিখতে পারবেন এবং কিছু পয়সা বেশি পাবেন ইত্যাদি।

পদ-পদবির নেশায় শিক্ষকরা অন্ধ হয়ে গেছেন। নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে গেছে তাদের মধ্য থেকে। দুর্নীতির কথা কী আর বলব। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাবেক উপাচার্য কী পরিমাণ দুর্নীতি করেছিলেন, তা কারও অজানা নয়। তিনি ঢাকঢোল পিটিয়েই দুর্নীতি করেছেন। অনেকে দুর্নীতি করে তাদের চেয়ার টিকিয়ে রেখেছেন, অনেকে উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ঢুকে যাওয়ার কারণে এসব যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে।

দুর্নীতির নৌকায় ভর করে অনেক শিক্ষকই প্রশাসনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছেন। এসব থেকে পয়সাপাতি উপরের লেভেলেও যেত। এভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য হওয়া, উপ-উপাচার্য হওয়া একটা তদবিরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে মেরিটের কোনো ব্যাপার নেই, রাজনৈতিক তাঁবেদারিই সব।

উপাচার্যের মতো পদে যে একজন স্কলার লোকের প্রয়োজন, এ ধারণাটি বিদায় নিয়েছিল গত ১৫ বছরে। আমার জানামতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে স্কলার লোকদের পদায়ন ২০০৬-০৭ সালের আগেই শেষ হয়ে গেছে। এর আগে এ পদগুলোতে মোটামুটি কিছুটা স্কলার লোক দেখা যেত। এরপর থেকে তেমনটি আর দেখা যায়নি। রাজনীতি, দলীয় চাটুকারিতাই হয়ে গেছে উপাচার্য হওয়ার জন্য প্রধান নিয়ামক, ফ্যাক্টর বা অনুঘটক।

শিক্ষাঙ্গনের এ অধঃপতন থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। যেমন চলমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ‘সৃজনশীল’ ফেলে দিয়ে আগের ফরমেটে ফেরত এনেছে। এটা

অবশ্যই উপকার দেবে। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বছর তো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। সেটা তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। যা হোক, আমরা চেষ্টা করলে শিক্ষাঙ্গন তার আগের চেহারায় ফিরে যেতে পারবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ, এটা হয়তো এখন আর অতটা কাজ করবে না। কারণ ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে দলীয় নিয়োগ, এটা নাকি করা হয়েছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। বিষয়টি হাস্যকরই বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রিক্রুট না করে ভোটার রিক্রুট করা হতো। ৫০ নম্বরের মেরিটে থাকা ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতেন।

অথচ মেধাবীরা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েও বাদ পড়েছেন। কারণ এখানে ভোটের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাধান্য পেয়েছে, মেধার ভিত্তিতে নয়। '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী যারা এটা করেছিল, ওটার উদ্দেশ্য হয়তো ভালো ছিল। কারণ স্কলারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটা চর্চা হতো। কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চার এ মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেনি এদেশে। আমার কাছে মনে হয় এ অর্ডিন্যান্সে পরিবর্তন আনতে হবে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদের যেমন রাজনীতি সীমিত করে দেওয়া উচিত, তেমনি শিক্ষকদের রাজনীতিও সীমিত করে দেওয়া উচিত।

শিক্ষকদের রাজনীতি অর্থাৎ দলাদলিতে না থাকাই ভালো। কারণ শিক্ষকদের প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া। দেশের মেরুদণ্ড শক্ত করা। কিন্তু রাজনীতিতে ঢুকে গেলে সেটা সম্ভব নয়। শিক্ষকরা রাজনীতির ছত্রছায়ায় না থাকলে শিক্ষার অবাধ পরিবেশের সৃষ্টি হবে, যেটা দেশ ও জাতির জন্য হবে মঙ্গলজনক। 'শিক্ষক রাজনীতি' কথাটি এসে গেল কীভাবে, চিন্তা করে দেখা উচিত। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক রাজনীতি কেন?

একজন শিক্ষক শিক্ষকতা করবেন, ছাত্রদের পড়াবেন, জাতি গঠন করবেন। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তাদের রাজনীতি করার কী আছে? শিক্ষক রাজনীতি মানে ডিভিশন, তোয়াজ এবং ওই তোয়াজের মাধ্যমে নিজের পছন্দ অনুযায়ী পদায়ন ও প্রমোশন। এজন্য শিক্ষক রাজনীতি থাকা উচিত নয়। লোভ-লালসার বলয় থেকে শিক্ষকদের বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলে অন্তত শিক্ষার পরিবেশটা সুন্দর হবে, মানসম্মত হবে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি মেরিট বেইজড সিলেকশন হতে হবে। মেরিট বেইজড প্রমোশন হতে হবে। এখানে প্রতিযোগিতা আছে, প্রত্যেক শিক্ষককে এসব প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করেই আসতে হয়। এক সময় এমনটাই ছিল। এখনো হয়তো আছে, কিন্তু সেটা কাগজে-কলমে।

আমার মতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল খাতে জোর দেওয়া উচিত। কারণ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল দেশের উদ্ভাবনী শক্তিকে ত্বরান্বিত করে। এতে নতুন নতুন সৃষ্টি গড়ে ওঠে। তাই সরকারের যে বরাদ্দ, সেগুলো বিজ্ঞান ও প্রকৌশল খাতে বেশি দেওয়া উচিত। গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারকে জোর দিতে হবে। তবে সেটা করার জন্য দলীয়করণ থেকে দূরে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। সর্বোপরি দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।

তাহলে গবেষণা হবে ঠিকমতো। যে কোনো ক্ষেত্রে সিলেকশনটা মেরিট বেইজড হতে হবে, দলীয় ভিত্তিতে নয়। উপাচার্যের দায়িত্ব যাকে দেওয়া হবে, তাকে স্কলার লোক হতে হবে। কারণ স্কলার লোক না দিয়ে ইনফেরিওর লোক দিলে তিনি ইনফেরিওর লোকই রিক্রুট করবেন। সুতরাং ইনফেরিওর লোক দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের অমানিশা দূর করা সম্ভব নয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সরকারের উচিত কিছু স্কলারশিপ দেওয়া। অন্তত ২০০-৩০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সরকার স্কলারশিপ দিতে পারে এবং তাদের দুবছর বিদেশে পাঠিয়ে পড়িয়ে আনতেও পারে। আমার মনে হয়, এতে খুব বেশি খরচ হবে না। আমাদের দেশ থেকে এক বছরে যে পরিমাণ ক্যাপিটাল চুরি, অর্থ পাচার হয়, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচও হবে না এ স্কলারশিপে।

দেশের ৫০০ মেধাবী ছাত্রকে যদি প্রতিবছর বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিয়ে আনা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আমরা অবশ্যই দেখতে পাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা নেই আমাদের দেশে। যারা নিজেরা চেষ্টা করে দু-একটা স্কলারশিপ পায়, তারা বিদেশে যায়। এটা খুবই নগণ্য। আর ধনী লোকেরা, যাদের প্রচুর অর্থ আছে, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব অর্থায়নে ৪ বছরের কোর্স, যাকে আন্ডারগার্ড বলি, সেটা বিদেশ থেকে করিয়ে আনতে পারে। সেটাও খুব বেশি নয়।

অথচ আমার দেখা মতে পাকিস্তান আমলে যাদের মেরিট বেশি ছিল, তাদের কোনো সমস্যা হয়নি পড়ালেখার ক্ষেত্রে। মেধাবীদের জন্য যথেষ্ট বড় বড় স্কলারশিপ ছিল। ফলে মেধাবীরা তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে হয়তো কিছুদিন এ প্রক্রিয়াটি চালু ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা ম্লান হয়ে গেছে।

মেরিট মূল্যায়নের বিষয়টি এখন আর খুব একটা দেখা যায় না। একজন গরিব মেধাবী ছাত্র কোনোরকম টিউশনি না করে ভালো রেজাল্ট করেছে এবং কোনো ধরনের আয়-রোজগার করা ছাড়া ক্লাশ ফাইভ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত যেতে পেরেছে, এমনটি এদেশ থেকে হারিয়ে গেছে। দেশের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী যে সামান্য টাকা স্কলারশিপের নামে দেওয়া হয়, সেটা দিয়ে কিছুই হয় না। আমাদের সময়ে স্কলারশিপে যে টাকা দেওয়া হতো, সেটা যথেষ্ট ছিল।

ওই টাকা দিয়ে আমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পেরেছি, কোনো ধরনের অসুবিধা হয়নি। আমি প্রতিটি স্কলারশিপ পেয়েছি। ওটাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। ওটা পাকিস্তানের সময়ই ছিল। আশির দশক, নব্বইয়ের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো উৎস থেকে কোনো আয় না করে শুধু স্কলারশিপের টাকায় পড়তে পারে, এটা আমার কাছে মনে হয় না। সুতরাং একজন গরিব মেধাবী ছাত্রকে তার লেখাপড়া চালানোর জন্য যদি টিউশনি বা চাকরি করতে হয়, তাহলে সে লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করবে কীভাবে?

এভাবে গরিব মেধাবীরা যদি হারিয়ে যেতে থাকে, তাহলে দেশ শিক্ষায় অনগ্রসরতার অতল গভীরে হারিয়ে যাবে। এ বিষয়গুলোতে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। অন্তত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আর শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। (অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার)

আবু আহমেদ : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ